Journal of Gono Bishwabidyalay
ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)
Journal Homepage: https://gonouniversity.edu.bd/research/journal-of-gb/

Original Article

লোকখাদ্য ও লোকজ সংস্কৃতি: বাংলাদেশের শেরপুর জেলার সাংস্কৃতিক পরিচয়ের বিনির্মাণ, সামাজিক রূপান্তর ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের নৃতাত্ত্বিক বীক্ষণ

শামসুন নাহার সেতু [১]*, মো. নাঈম হোসেন (নাঈম রাজ)[২], সাবরিনা নাছরিন[৩]

[১] বাংলা বিভাগ, গণ বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪৪।
[২] মো. নাঈম হোসেন (নাঈম রাজ) ইন্ডিয়ান থিয়েটার বিভাগ, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়,ভারত।
[৩] বাংলা বিভাগ, গণ বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪৪।

*** Corresponding Author:** শামসুন নাহার সেতু; ইমেইল: setu.bangla44@gmail.com ; Mobile: +৮৮০১৭৭৭৮৩৬৪০৮।
Received: 02/08/ 2026; **Accepted**: 04/11/2026; **Online Available**: 12/11/2026.

সারসংক্ষেপ

যে কোন দেশ অবকাঠামো ও কাঠামো এই দুই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। রাষ্ট্র ও জাতিকে উন্নত ও সক্রিয় রাখতে এই দুটি অনুষঙ্গকে সমানুপাতিক আঙ্গিকে সচল রাখতে হয়। যার একটি যদি অন্যটির থেকে পিছিয়ে যায় তবে সেই রাষ্ট্র বা সভ্যতা ক্রমান্বয়ে পতনের দিকে ধাবিত হয়। রাষ্ট্রের অবকাঠামোগত ভিত্তি বলতে প্রতিষ্ঠান বা এলাকার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক অস্তিত্বগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা যেমন: শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, পানি সরবরাহ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বাজার ব্যবস্থা, আন্তর্জাল (ইন্টারনেট), তথ্যপ্রযুক্তি ইত্যাদিকে বোঝায়। অন্যদিকে কাঠামোগত ভিত্তি বলতে কোনো বস্তু, প্রতিষ্ঠান, ব্যবস্থা বা বিষয়ের গঠন, বিন্যাস বা সংগঠন-পদ্ধতি বোঝায়। অর্থাৎ কোনো কিছু কীভাবে সাজানো বা নির্মিত হয়েছে সেটিই তার কাঠামো। সংস্কৃতিই হলো রাষ্ট্রের কাঠামোগত ভিত্তির প্রধান প্রাণশক্তি। লোকজ সংস্কৃতি ও লোকখাদ্য বাংলাদেশের সংস্কৃতির আদি শেকড়। লোকজ সংস্কৃতি ও লোকখাদ্য একটি জনগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা, সামাজিক বন্ধন, সাংস্কৃতিক পরিচয় ও জীবন-জগতের গুরুত্বপূর্ণ বহিঃপ্রকাশ। এই গবেষণা প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের ময়মনসিংহ বিভাগের শেরপুর জেলার লোকজ সংস্কৃতির পরিচয় ও তা বিনির্মাণের প্রথম শর্ত লোকখাদ্য কিভাবে সামাজিক রূপান্তর ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য সংরক্ষণ করে তার একটি নৃতাত্ত্বিক পর্যালোচনা করা। সেই লক্ষ্য পূরণে প্রবন্ধটিতে বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণধর্মীতার আলোকে গুণগত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে লোকজ সংস্কৃতি ও লোকখাদ্যের সাথে শেরপুর জেলা কীভাবে সংযুক্ত তা ব্যাখ্যা করা। পাশাপাশি এসকল পরিবর্তনের সাথে কীভাবে সেই ভূখণ্ডের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক রূপান্তর ঘটে, সংস্কৃতি সংরক্ষণের গুরুত্ব এবং প্রতিবন্ধকতাগুলো বিশ্লেষণ করা। একই সঙ্গে এই প্রবন্ধে প্রতীয়মান হয়েছে যে, শেরপুরের লোকখাদ্য ও লোকজ সংস্কৃতি স্থানীয় সাংস্কৃতিক পরিচয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হলেও আধুনিকতা ও বৈশ্বিক পরিবর্তনের প্রভাবে তা ক্রমাগত রূপান্তরিত হচ্ছে। তাই জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের স্বার্থে এসব ঐতিহ্যের পদ্ধতিগত নথিভুক্তকরণ, সংরক্ষণ এবং প্রজন্মান্তরে জ্ঞান স্থানান্তর অপরিহার্যতার স্বরূপ অনুসন্ধান করা হয়েছে।

মূল শব্দ সূচক: *লোকখাদ্য, লোকজ সংস্কৃতি, সাংস্কৃতিক পরিচয়ের বিনির্মাণ, সামাজিক রূপান্তর, নৃতাত্ত্বিক বীক্ষণ, শেরপুর*

ভূমিকা

"সংস্কৃতি একাধারে জীবনযাত্রার নিয়মপদ্ধতি, যথা- আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, উৎসব-অনুষ্ঠান, ধর্মকর্ম, প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপ, শিক্ষাদীক্ষা, খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি; অন্যদিকে জীবন যাপনের যাবতীয় বস্তু ও উপকরণ, ঘরবাড়ি, খাদ্যদ্রব্য, আসবাবপত্র, যানবাহন, যন্ত্রপাতি, বস্ত্র-অলংকার ইত্যাদি। সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, মূর্তি, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি। এসব কিছুর সমন্বয় হল সংস্কৃতির সাধারণ পরিচয়।" [১] এটি সংস্কৃতির সামগ্রিক পরিচয় হলে সংস্কৃতিকে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায় "ক) লোকজ বা লোক সংস্কৃতি ও খ) নগর সংস্কৃতি।" [২] লোকজ সংস্কৃতি একটি জাতির প্রকৃত আত্মপরিচয়ের প্রধান চালিকা। সভ্যতার প্রকৃত প্রাণ, মাটির গন্ধ, স্নিগ্ধতা এবং প্রকৃতির নৈকট্য গ্রামে যেভাবে পাওয়া যায় তা নগর বা নাগরিক জীবনে পাওয়া যায় না। একটি সম্প্রদায় ও সভ্যতার নিজস্ব শক্তিশালী সংস্কৃতি তৈরি হয় সেই জনপদের লৌকিক ও প্রান্তিক পর্যায় থেকে। লোক সংস্কৃতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ড. ওয়াকিল আহমদ বাংলার লোক-সংস্কৃতি বইয়ে বলেন:

> "একটি দেশের একটি জাতির মৌলিকতা ও স্বকীয়তার পবিচয় তার লোক-সংস্কৃতির দ্বারাই সম্ভব।" [৩]

এখানে তিনি লোক বা লোকজ সংস্কৃতিকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন। এখান থেকে বলা যায় মানুষের জীবন তার লোকসংস্কৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেহেতু লোকজ সংস্কৃতি আলোচনার প্রধান উপজীব্য, সেই নিমিত্তে সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, লৌকিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত লোকজ সংস্কৃতির প্রধান উপাদানগুলো হলো- ক) লোকাচার, খ) লোকবিশ্বাস, গ) লোকসংস্কার, ঘ) লোকখাদ্য ও ঙ) উৎসব-পার্বণ। এই শ্রেণিগুলোর মধ্যে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয় লোকখাদ্য।
মানুষের বেঁচে থাকার জন্য মৌলিক শর্তগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো খাদ্য। শিশু জন্মের পরই তার ইন্দ্রিয়গত প্রথম খাদ্য প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। মানব দেহকে সক্রিয় রাখতে, বিকাশ ও পুষ্টির যোগান দিতে খাদ্যের কোন বিকল্প নাই। মানুষ খাদ্য সামগ্রী পারিপার্শ্বিক উৎস থেকেই আহরণ করে থাকে। কোন ভূখণ্ডের মানুষদের খাদ্যাভ্যাস গড়ে উঠে সে জনপদের ভৌগোলিক পরিবেশ ও খাদ্যের প্রাপ্যতার উপর। দেখা যায়, আদি অরণ্যচারী সমাজ থেকে কৃষিতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা অবধি কালের পরিক্রমায় মানুষের খাদ্যাভ্যাস ও তার রূপান্তরের দিক। লোকখাদ্যকে শুধুমাত্র খাদ্যাভ্যাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে হয় না কারণ তা সাংস্কৃতিক পরিচয় বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে। এ প্রবন্ধে লোকখাদ্য কেবল খাদ্যাভ্যাস হিসেবে নয়, বস্তুত একে সাংস্কৃতিক পরিচয় নির্মাণ, সামাজিক সংহতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

বাংলাদেশের ময়মনসিংহ বিভাগের শেরপুর জেলায় সহজাত প্রবৃত্তিতেই একটি স্বতন্ত্র লোকখাদ্য ও লোকজ সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। যা স্থানীয় ভূপ্রকৃতি, কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি, নদী, বনজ সম্পদ, ঋতুচক্র, ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার, পার্বণ এবং দীর্ঘকালব্যাপী সামাজিক অনুশীলনের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে।

বর্তমান পরিবর্তনশীল পৃথিবীর একবিংশ শতাব্দীতে এসে বৈশ্বিক পরিবর্তনের সাথে শেরপুরের লোকখাদ্য ও লোকজ সংস্কৃতির বিস্তর পরিবর্তন ঘটেছে। জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিক্রিয়ায় সরাসরি আবহাওয়া ও ভৌগোলিক কাঠামোতে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। ফলশ্রুতিতে, ঐতিহ্যবাহী লোকখাদ্য ও লোকজ সংস্কৃতিতে উল্লেখযোগ্য রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়। হাজার বছরের অসংখ্য খাদ্য উৎস বিলুপ্ত হয়েছে, কিছু বিলুপ্তির পথে। নতুন খাদ্যাভ্যাস, বাণিজ্যিক খাদ্যসংস্কৃতির প্রসার এবং পরিবর্তিত সামাজিক বাস্তবতা একদিকে সাংস্কৃতিক অভিযোজনের নতুন ক্ষেত্র তৈরি করছে, অন্যদিকে বহু ঐতিহ্যবাহী খাদ্যজ্ঞান, রন্ধনপ্রণালি এবং লোকাচার হারানোর পথে। ফলস্বরূপ, লোকখাদ্য ও লোকজ সংস্কৃতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। সেই সংকট বিবেচনায় লোকখাদ্যকে ঘিরে সাংস্কৃতিক পরিচয়ের বিনির্মাণ, সামাজিক রূপান্তর ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের প্রশ্ন বর্তমান প্রবন্ধে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সংস্কৃতি জীবনের মতো সত্য। মানুষের জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি হলো লোকখাদ্য। যা প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। যার সাথে পরিবর্তন হচ্ছে সংস্কৃতি, সমাজ, ঐতিহ্য ও আন্তঃপরিচয়। তাই এই গবেষণা প্রবন্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের ময়মনসিংহ বিভাগের শেরপুর জেলার লোকখাদ্য ও লোকজ সংস্কৃতির সম্পর্ককে নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা। লোকখাদ্য কীভাবে সাংস্কৃতিক পরিচয়ের বিনির্মাণ, সামাজিক রূপান্তর ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে ভূমিকা রাখে তা অনুসন্ধান করা। পাশাপাশি সমকালীন সামাজিক ও বৈশ্বিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে শেরপুরের লোকখাদ্য ও লোকজ সংস্কৃতির পরিবর্তনশীল রূপ পর্যালোচনা করা। তাছাড়াও এর অন্তর্নিহিত সাংস্কৃতিক তাৎপর্য এবং টেকসই সংরক্ষণের সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা পর্যালোচনা করা।

সাহিত্য পর্যালোচনা ও তাত্ত্বিক কাঠামো

লোকখাদ্য, লোকজ সংস্কৃতি এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় নিয়ে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা সম্পন্ন হয়েছে। খাদ্য-নৃতত্ত্ব, সাংস্কৃতিক অধ্যয়ন এবং ঐতিহ্য গবেষণায় লোকখাদ্যকে একটি জনগোষ্ঠীর সামাজিক জীবন, আঞ্চলিক পরিচয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তদ্রূপ বাংলাদেশের খাদ্যসংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণায় বিভিন্ন অঞ্চলের লোকখাদ্য ও লোকজ সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য, পরিবর্তন এবং সংরক্ষণ বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু শেরপুর জেলার লোকখাদ্য ও লোকজ সংস্কৃতিকে সাংস্কৃতিক পরিচয়ের বিনির্মাণ, সামাজিক রূপান্তর এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণের সমন্বিত নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করার প্রচেষ্টা তুলনামূলকভাবে কম। বিশ্লেষণ, অনুসন্ধান, তথ্য সংগ্রহ ও বর্ণনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার

করে এই প্রবন্ধে তাত্ত্বিক কাঠামো হিসেবে লোকখাদ্য ও লোকজ সংস্কৃতির রূপান্তর এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণের প্রশ্নকে নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের আলোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণা প্রবন্ধটি মূলত একটি গুণগত পদ্ধতির গবেষণা। এতে বিশ্লেষণ ও বর্ণনামূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে নৃতাত্ত্বিক গবেষণা আঙ্গিক অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষণার মৌলিক উৎস হিসেবে ক্ষেত্রসমীক্ষা, অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার, মৌখিক বর্ণনা এবং অনানুষ্ঠানিক আলাপ ব্যবহৃত হয়েছে। সহায়ক উৎস হিসেবে বিভিন্ন গ্রন্থ, ঐতিহাসিক দলিল, আদমশুমারি তথ্য, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট নথিপত্রের সহায়তা নেওয়া হয়েছে।

জনমিতিক

বাংলাদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির উর্বর ভূমি ময়মনসিংহ বিভাগের শেরপুর জেলা। যে জনপদের ঐতিহাসিক অপার সম্ভাবনা ও সমৃদ্ধি রয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়নের সর্বশেষ ২০২৬ সালের হাল-নাগাদ তথ্য অনুযায়ী শেরপুর জেলার "মোট জনসংখ্যা ১৫,০১,৮৫৩ জনের ৭৩,২,৪৩৩ জন পুরুষ, ৭৬,৮,৮৫৭ জন মহিলা এবং ১২২ জন লিঙ্গ-বৈচিত্র্যময় ব্যক্তি। এর মধ্যে মুসলিম ১৪,৫৬,০৮০ জন, হিন্দু ৩৬,৮২৭ জন, আদিবাসী ১১,০৮২ জন ও অন্যান্য ধর্মের মানুষ ১,২৪৩ জন লিপিবদ্ধ আছেন। যেখানে জনঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১,১০০ জন।" [৪] এই তথ্য থেকে স্পষ্ট প্রতীয়য়মান হয় যে শেরপুর জেলা জনসম্পদে পরিপূর্ণ। শেরপুর জেলাকে দুটি পর্বে ভাগ করা যায় ক) নগরসভ্যতা, খ) গ্রামসভ্যতা। শেরপুরে "উপজেলা ৫টি (সদর, নকলা, নালিতাবাড়ি, ঝিনাইগাতি, শ্রীবরদী), পৌরসভা ৪টি (শেরপুর, নকলা, নালিতাবাড়ি, শ্রীবরদী), ইউনিয়ন ৫২টি ও গ্রাম ৬৭৮টি।" [৫] যা থেকে বোঝা যায় এই জেলায় গ্রামসভ্যতার ভৌগোলিক পরিসীমা নগরসভ্যতা থেকে বেশি। ১৩৬৩.৭৬ বর্গ কিলোমিটার ভূখণ্ডে ১,০৫,৫১৭ হেক্টর জমিই আবাদী। বহু জাতি ও সংস্কৃতির জেলা শেরপুরে বাঙালিদের পাশাপাশি "গারো (১০, ৪৫৬জন), কোচ (২,৫৩৯ জন), বর্মণ (৩,১৯৮ জন), হদি, ডালু, বানাই" [৬] আদিবাসী সহ অন্যান্য অধিবাসীরা বসবাস করেন।

ভূ-ঐতিহাসিক ও সমাজ-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত



সূত্র: বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন।

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। যার দক্ষিণ অংশে বঙ্গোপসাগরে সকল নদ-নদী এসে সমন্বিতভাবে পতিত হয়েছে। বন, শস্যভূমি, উঁচুনিচু টিলাঞ্চল, পাহাড় সব মিলিয়ে এক ভ্রাতৃত্বময় সৌন্দর্যে ঘেরা এই বদ্বীপ। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের সীমান্তবর্তী জেলা শেরপুর প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার এবং সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক অনন্য জনপদ। জেলার উত্তর প্রান্তজুড়ে বিস্তৃত মেঘালয়ের গারো পাহাড় এবং দক্ষিণে আদি ব্রহ্মপুত্রের পলিবাহিত উর্বর সমভূমি এ অঞ্চলের ভূপ্রকৃতিকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য

প্রদান করেছে। বর্ষা মৌসুমে আসাম ও মেঘালয়ের পার্বত্য অঞ্চল থেকে নেমে আসা অসংখ্য জলধারা শেরপুরের প্রকৃতিকে আরও প্রাণবন্ত ও মনোরম করে তোলে। উর্বর কৃষিজমি, নদীনির্ভর জীবনযাত্রা এবং প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য এ জনপদকে দীর্ঘকাল ধরে জনবসতি ও কৃষিসভ্যতার জন্য উপযোগী করে তুলেছে। একই সঙ্গে সাহিত্য, লোকসংস্কৃতি, সংগ্রামী ইতিহাস এবং সামাজিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিক বিকাশ শেরপুরকে বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ভূপ্রদেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায়, সুদূর অতীতে এই অঞ্চল প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা এর প্রাচীন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বের সাক্ষ্য বহন করে। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে ১৭৮৬ সালে ময়মনসিংহ জেলা হিসেবে স্বীকৃতি পেলে শেরপুর তার অন্তর্ভুক্ত হয়; ১৭৮৯ সালে মহকুমা এবং ১৯৮৪ সালে শেরপুরকে জেলায় উন্নীত করা হয়।

একটি জাতির রুচি ও সমৃদ্ধির মাপকাঠি তার সংস্কৃতি। সংস্কৃতি ও সভ্যতা একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ হলেও তাদের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পার্থক্য বিদ্যমান। হারস্কোভিট্স মনে করেন, 'Culture is the man-made part of the environment.' . সদৃশ ঐতিহ্য ও আত্মবোধ ধারণকৃত সেই জাতি, যাদের দৈনন্দিন জীবনপ্রবাহের অভ্যন্তরে অস্তিত্বশীল প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনদর্শন এবং সভ্যতার নির্দিষ্ট বহিঃপ্রকাশ, যা নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে বিশ্বপরিসরে তার স্বতন্ত্র পরিচয় ও অবস্থান প্রদান করে। জাতি হিসেবে সেই জাতি নিজস্ব মৌলিক ও পৃথকীকৃত সংস্কৃতির স্থপতি। এ বিষয়ে ক্লাইভ ক্লাক্হোন বলেন, 'To the anthropologist, however, to be human is to be cultured.' [৮] শেরপুরের ভৌগলিক ও সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা সে ভূখণ্ডের মানুষের জীবন সংগ্রাম, বিশ্বাস, আচার-আচরণ, চিন্তা, মূল্যবোধ, রুচি, শিল্প-সাহিত্য, কৃষিব্যবস্থা, ধর্ম, খাবার, উৎসব ও পোশাক ব্যবহারের যে ঐতিহাসিক সম্মিলিত চর্চা ও পরিশীলিত রূপ তার ঐতিহ্যকে বহন করে। খাদ্যব্যবস্থা সংস্কৃতির নিগূঢ় উপাদান। পিনস্ট্রুপ-অ্যান্ডারসেন ও ওয়াটসন (২০১১) বলেন -"খাদ্যব্যবস্থা হলো খাদ্য উৎপাদন, সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বণ্টন, প্রস্তুতকরণ ও ভোগসংক্রান্ত সকল কার্যক্রম এবং এসব কার্যক্রমকে প্রভাবিতকারী রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সমন্বিত রূপ।" [৯]

খাদ্যব্যবস্থা পর্যালোচনা করে কোন নির্দিষ্ট জনসমাজের পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাস্তবতা অনুসন্ধান করা যায়। ঔপনিবেশিক (ব্রিটিশ-পূর্ববর্তী, ব্রিটিশ আমল ও পাকিস্তান আমল) সময় থেকে উত্তর ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার দিকে নজর দিলে দেখা যায়, কালের পরিক্রমায় সামগ্রিক পরিবর্তনের হাত ধরে শেরপুর জেলার লোকজ খাদ্য ও সাংস্কৃতিক পরিসরে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। খাদ্যব্যবস্থা, উৎপাদন, আবহাওয়া, রাজনীতি, অর্থনীতি কিংবা সমাজের অন্য কোন মৌলিক নীতির একটির সামান্যতম পরিবর্তন মানে সামগ্রিক সমাজ ব্যবস্থার উপর প্রভাব পড়া। বহু রাজনৈতিক জটিলতা, ঔপনিবেশিকতা, ক্ষমতার পালাবদল, দেশভাগ ও ভূমিকম্প (১৮৯৭ সালের ভয়াবহ ভূমিকম্পে ব্রহ্মপুত্র নদের গতিপথ পশ্চিম দিকে সরে যমুনা নদীর সাথে মিলিত হয়। যাতে ঘরবাড়ি, আবাদী জমিসহ বহু সম্পদের ক্ষতি হওয়ার পাশাপাশি শেরপুরের ভৌগলিক মানচিত্রের পরিবর্তন হয়) এমন সব ঘটনায় শেরপুর অঞ্চলের ভৌগলিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। যার প্রভাব সরাসরি সংস্কৃতিতে এসে পড়ে। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে শেরপুর শিক্ষা, সাহিত্য ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সংস্কৃতিতে অবিভক্ত ভারতবর্ষ হতে বর্তমান আধুনিক বাংলাদেশে তার স্বকীয়তা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করলেও তা অক্ষুণ্ন থাকেনি।

শেরপুর জেলার মাটি লোকসংস্কৃতি ও সাহিত্যের স্ববাচক ভঙ্গিমায় মাথা উঁচু করে সময়ের সাক্ষ্য বহন করে চলছে। দরবেশ জরিপ শাহ্, মজনু শাহ্ পাগল, টিপু শাহ পাগল, শাহ কামাল, শেখ কাদের ইয়েমেনী, বুড়াপীর, ছাওয়াল পীরের মতো অসংখ্য গাজী, পীর, ফকিরদের আধ্যাত্মিক ও সাধন পীঠ ছিল শেরপুর, যাদের সংস্পর্শে এই এলাকা আরও মিশ্রিত সাংস্কৃতিক রূপ লাভ করে। বৃহত্তর ময়মনসিংহ জনপদের অমূল্য সাহিত্যরত্ন ময়মনসিংহ গীতিকা; যার লিখিত পাণ্ডুলিপি সাহিত্য হলেও এর মধ্যে বৃহত্তর ময়মনসিংহ জনপদের লোকজীবন, প্রেম, সমাজ, ধর্মীয় বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতিফলনস্বরূপ এক অমূল্য সম্পদ যা এই ভূখণ্ডের মানুষদের জীবনগীত-রঙ্গকেই উপস্থাপন করে। এ প্রবন্ধের পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে তৎকালীন শেরপুর ছিল বৃহত্তর ময়মনসিংহের একটি অঞ্চল। সুতরাং, ময়মনসিংহ গীতিকায় শেরপুরের ভূমিকা থাকবে এটাই স্বাভাবিক। এ ছাড়া দেখা যায়, "বর্তমান শেরপুর জিলায় মাত্র দুইজন পুঁথিকারের সন্ধান পাওয়া যায়। এরা হলেন বসির উদ্দিন মুন্সী ও রমজান আলী মুন্সী। বসিরউদ্দিন মুন্সীর পুঁথির নাম 'শাহাদত নামা' ও 'শের আলী খান ও পদ্মিনী কন্যার পুঁথি' এবং রমজান আলী মুন্সীর পুঁথির নাম 'ছহিহ তাহইয়াতুচ্ছালাত'।" [১০] দেখা যাচ্ছে শেরপুরে পুঁথি চর্চা তখন ছিল। শুধু পুঁথিপাঠই নয় জারি-সারি গান, বাউল গান, কবিগান, ভাওয়াইয়া, পল্লীগীতি প্রভৃতি শেরপুর জেলাকে সাংস্কৃতিক প্রাণ দিয়েছে। পুঁথিপাঠের আসর কেবল সাহিত্যপাঠের অনুষ্ঠান নয়, এটি ছিল একই সাথে ধর্মীয় চেতনা, পৌরাণিক ও লোককাহিনি, লোকশিক্ষা, সামাজিক মিলনমেলা, বিনোদন ও

আতিথেয়তার সামগ্রিক সাংস্কৃতিক পরিসর। মুখরোচক খাদ্য পরিবেশন ছিল সেই সামাজিক সৌহার্দ্য ও অতিথি আপ্যায়নের মৌলিক অংশ। পুঁথিপাঠের আসরে তৎকালীন সময়ে দর্শকদের উদ্দেশ্যে মুড়ি, চিড়া, গুড়, খই, নাড়ু, পান-সুপারি প্রভৃতি খাবার দিয়ে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হতো।

লোকজ সংস্কৃতির একটি প্রধান উপাদান হল লোকাচার। শেরপুর জেলায় ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত লোকাচারগুলিকে এভাবে বিভক্ত করা যেতে পারে-

১. **জন্মকেন্দ্রিক লোকাচার:** শেরপুর জেলার বৈচিত্রময় জনসমাজের মধ্যে নিজস্ব লোকাচার আছে। শেরপুর জেলায় মাজারকেন্দ্রিক সংস্কৃতির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, রোগব্যাধি আরোগ্য লাভ কামনা ক্ষেত্রে মানত করা, খাওয়া দাওয়া রীতি। যেমন মুসলমান সমাজে জন্মকেন্দ্রিক লোকাচার হিসেবে "সুন্নতে খাৎনা" করানো ইত্যাদি।

২. **বিবাহকেন্দ্রিক লোকাচার:** হিন্দু সম্প্রদায়ের বিবাহকেন্দ্রিক লোকাচার তুলনামূলকভাবে বৈচিত্রময় তাই এই গোত্রের বিয়ের সংস্কৃতি তুলে ধরা হলো। যেমন পাত্র-পাত্রীর নির্বাচন, কুল, গোত্র ও বংশ যাচাই, পাকা দেখা বা বিবাহের সিদ্ধান্ত, শুভদিন ও লগ্ন নির্ধারণ, গায়ে হলুদ, আইবুড়ো ভাত, বরযাত্রা, বর-কনের বরণ, মালা বদল, সাতপাক ও বিবাহের মূল আচার, সিঁদুরদান, কন্যাদান, আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের অংশগ্রহণ, বিদায় ও গৃহপ্রবেশ ইত্যাদি।

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বিবাহকেন্দ্রিক লোকাচার:

ক) গারো জনগোষ্ঠী: (গোত্র বা মাহারি- ভিত্তিক বিবাহনীতি, মাতৃসূত্রীয় সামাজিক কাঠামোর প্রভাব, পরিবারের সম্মতি, ঐতিহ্যগত 'বর ধরে আনা' প্রথা, 'থুনাপ্পা' বিবাহ)।

খ) হাজং জনগোষ্ঠী: (সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহের প্রবণতা, পারিবারিকভাবে বিবাহ নির্ধারণ, পণ ও কনের পরিবারের ভূমিকা, পুরোহিত ও ঐতিহ্যবাহী আচার, ঢাল-তলোয়ারের ঐতিহ্য)

৩. মৃত্যুকেন্দ্রিক লোকাচার:

ক) মুসলিম সম্প্রদায়ের মৃত্যুকেন্দ্রিক লোকাচার: মৃত্যুর পূর্বে দোয়া ও কালেমা পাঠ, মৃত্যুর সংবাদ প্রচার, মৃতদেহ গোসল করানো, কাফন পরানো, জানাজা, দাফন, কবর জিয়ারত ও দোয়া, শোক পালন, মিলাদ, কোরআনখানি এবং খাবার আয়োজন ও সামাজিক সহযোগিতা।

খ) হিন্দু সম্প্রদায়ের মৃত্যুকেন্দ্রিক লোকাচার: মৃত্যুর সংবাদ জানানো, মৃতদেহ স্নান করানো, শবযাত্রা, মুখাগ্নি, দাহক্রিয়া, অস্থি সংগ্রহ ও বিসর্জন, অশৌচ পালন, শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান, পিণ্ডদান ও তর্পণ।

গ) আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মৃত্যুকেন্দ্রিক লোকাচার: গারো জনগোষ্ঠী: মৃত্যুর সংবাদ ও সামাজিক সমাবেশ, মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, প্রার্থনা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান, কবর দেওয়া এবং সম্প্রদায়গত অংশগ্রহণ। হাজং জনগোষ্ঠী: মৃত্যুর সংবাদ প্রচার, মৃতদেহের শেষকৃত্য, শোক পালন, অশৌচ পালন, শ্রাদ্ধ ও স্মরণ অনুষ্ঠান এবং পূর্বপুরুষের স্মরণ।

৪. **ধর্মকেন্দ্রিক লোকাচার:** মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মকেন্দ্রিক লোকাচার পীর-মাজারকেন্দ্রিক লোকাচার, মানত করার প্রথা, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল, ওরশ পালন, মাজারে চাদর, ফুল বা অন্যান্য সামগ্রী দেওয়া, মসজিদকেন্দ্রিক সামাজিক আচার, রমজানকেন্দ্রিক লোকাচার, ঈদকেন্দ্রিক লোকাচার, মহররমকেন্দ্রিক লোকাচার এবং কোরআনখানি ও মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া।

৫. বিশ্বাসকেন্দ্রিক লোকাচার:

ক) মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিশ্বাসকেন্দ্রিক লোকাচার : নজর লাগার বিশ্বাস, তাবিজ-কবচ ব্যবহারের রীতি, পীর ফকিরের প্রতি বিশ্বাস, মাজারকেন্দ্রিক বিশ্বাস, মানতের বিশ্বাস, ভূত-জিনের বিশ্বাস, স্বপ্নের ব্যাখ্যা, শুভ-অশুভ লক্ষণ, বাড়ি নির্মাণের শুভ সময় এবং রোগ নিরাময়ে লোকবিশ্বাস।

খ) হিন্দু জনগোষ্ঠীর বিশ্বাসকেন্দ্রিক লোকাচার: নজর বা কুনজরের বিশ্বাস, ব্রত পালনের বিশ্বাস, পবিত্র বৃক্ষকেন্দ্রিক বিশ্বাস, তুলসীকে পবিত্র মনে করা, গৃহদেবতা ও স্থানদেবতার বিশ্বাস, জ্যোতিষ ও শুভক্ষণ ইত্যাদি।

গ) শেরপুরের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বিশ্বাসকেন্দ্রিক লোকাচার: গারো জনগোষ্ঠী (প্রকৃতিকেন্দ্রিক বিশ্বাস, পূর্বপুরুষের প্রতি বিশ্বাস, আত্মা ও অদৃশ্য শক্তির বিশ্বাস, ফসল ও কৃষিকেন্দ্রিক বিশ্বাস, হাজং জনগোষ্ঠী (স্থানীয় দেবতা ও শক্তির প্রতি বিশ্বাস)।

৬. **অন্যান্য লোকাচার:** খাদ্যকেন্দ্রিক লোকাচার, ঋতু ও প্রকৃতিকেন্দ্রিক লোকাচার, গৃহস্থালি ও গৃহনির্মাণকেন্দ্রিক লোকাচার, রোগ-ব্যাধি ও চিকিৎসাকেন্দ্রিক লোকাচার, পোশাক ও অলংকারকেন্দ্রিক লোকাচার, শিশুকেন্দ্রিক লোকাচার, নারীকেন্দ্রিক লোকাচার, লোকবিনোদন ও খেলাধুলা, মেলা ও হাটকেন্দ্রিক লোকাচার এবং প্রাণীকেন্দ্রিক লোকবিশ্বাস।

সবগুলো লোকাচার মুসলিম, হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। পাশাপাশি শেরপুর জেলার আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক নিজস্বতা আছে। তাদের ভাষা ও খাবার ভিন্নতা বিদ্যমান। গারোদের ওয়ানগালা, দিকমান্দা, কোচদের বিহু, বর্মণ জনগোষ্ঠীর বিবাহ অনুষ্ঠান, ধর্মীয় পূজা-পার্বণ, নববর্ষ উদযাপন, সামাজিক মিলন অনুষ্ঠান; হদি (হদি) জনগোষ্ঠীর পারিবারিক আচার, লোকসংগীত ও নৃত্য; ডালুদের লোকবিশ্বাস, কৃষিনির্ভর জীবন; বানাইদের পারিবারিক অনুষ্ঠান, ধর্মীয় বিশ্বাস, লোকাচার শেরপুর জেলাকে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য দিয়েছে। পোশাকেও শেরপুর জেলার মানুষ বৈচিত্র্য। এখানে মুসলিম, হিন্দু, খ্রিষ্টানসহ বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পাশাপাশি গারো, কোচ, বর্মণ, ডালু, হদি ও বানাই আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। মুসলিম পুরুষরা সাধারণত লুঙ্গি, পাঞ্জাবি ও পায়জামা এবং নারীরা শাড়ি ও সালোয়ার-কামিজ পরিধান করেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের পুরুষদের মধ্যে ধুতি-পাঞ্জাবি এবং নারীদের মধ্যে শাড়ির প্রচলন রয়েছে। গারো নারীদের ঐতিহ্যবাহী ডকমান্ডা ও ডকশারি এবং পুরুষদের গামছা বা লুঙ্গিসদৃশ পোশাক তাদের স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিচয় বহন করে। কোচ, বর্মণ, ডালু, হদি ও বানাই জনগোষ্ঠীর মধ্যেও নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী পোশাকের প্রচলন ছিল। যদিও বর্তমানে আধুনিক পোশাকের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। তবুও ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উৎসব-অনুষ্ঠানে এসব সম্প্রদায় এখনও তাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিধানের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ করে চলেছে।

লোকখাদ্যের বৈচিত্র্য ও রন্ধনপ্রণালী

খাদ্য শুধুমাত্র মানুষকে বাঁচিয়েই রাখে না তার চিন্তা, আচরণ এবং সামাজিক পরিস্থিতিকেও প্রভাবিত করে। ভূখণ্ড, দেশ ও জলবায়ু ভেদে মানুষের দৈহিক গঠন ও গড়নের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। গরমপ্রধান দেশের মানুষের দৈহিক কাঠামো ও শীতপ্রধান দেশের মানুষের দৈহিক কাঠামোতে জিনগত ভাবেই ভিন্নতা রয়েছে। শেরপুর জেলা একটি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল। এখানে সমতল, নদী ও পাহাড় বেষ্টিত মানুষের দৈহিক গড়ন অন্যান্য জনপদ থেকে ভিন্ন। এই ভিন্নতা সেখানের জলবায়ু, আবহাওয়া ও উৎপাদিত ফসল থেকে আহরিত খাবারের উপর নির্ভর করে। কৃষিনির্ভর শেরপুর জেলার লোকখাদ্য কৃষিজ ফসল ও মাছের উপর বেশি নির্ভর করে। শেরপুর জেলায় ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলোকে পর্যালোচনা করলে লোকখাদ্যকে প্রধানত তিনভাগে মূল্যায়ন করা যায়- ১) শস্যজাতীয় লোকখাদ্য, ২) আমিষজাতীয় লোকখাদ্য ৩) শাকজাতীয় লোকখাদ্য। শেরপুর জেলা সামগ্রিক ও ঐতিহাসিকভাবে কৃষিভিত্তিক এবং নদীমাতৃক জনপদ। এই ভূখণ্ডের প্রধান উৎপাদিত ফসল হলো "ধান, গম, সরিষা, পাট, বাদাম, ভুট্টা, গোলআলু ও মরিচ।" [১১]

সারণি ১: উৎপাদিত ফসল দিয়ে শেরপুরের লোকখাদ্য

কৃষিপণ্য	**শেরপুরের ঐতিহ্যবাহী লোকখাদ্য**
ধান	ভাত, পান্তাভাত, চিড়া, মুড়ি, খই, চালের গুঁড়ার পিঠা (চিতই, ভাপা, পাটিসাপটা, পুলি, পাকান), ক্ষীর, পায়েস
গম	আটার রুটি, লুচি, পরোটা, হালুয়া, আটার পিঠা
সরিষা	সরিষার তেল, সরিষাবাটা দিয়ে মাছ, সরিষার শাক
পাট	পাটশাক ভাজি, পাটশাকের ঝোল, পাটশাক-চিংড়ি

বাদাম	ভাজা বাদাম, বাদামের নাড়ু, গুড়-বাদাম, বাদামের খাজা (স্থানভেদে)
ভুট্টা	ভাজা ভুট্টা, সেদ্ধ ভুট্টা, খইজাতীয় ভুট্টা, ভুট্টার আটা দিয়ে রুটি
গোলআলু	আলুভর্তা, আলুভাজি, আলুর তরকারি, আলু-মাছ, আলুর দম
মরিচ	কাঁচামরিচ ভর্তা, শুকনা মরিচ ভর্তা, বিভিন্ন রান্নায় মসলা হিসেবে ব্যবহার

সূত্রঃ ক্ষেত্রসমীক্ষা, শেরপুর জেলা, ২০২৫

প্রতিটি খাবারের রন্ধনপ্রণালিতে রন্ধনপ্রণালীতে স্বতন্ত্রতা আছে। শেরপুরের প্রধান খাদ্যশস্য হলো ধান। ধান থেকে উৎপাদিত চাল স্থানীয় মানুষের প্রধান খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। চাল দিয়ে ভাতের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের পিঠা, নাড়ু ও ঐতিহ্যবাহী খাবার তৈরি করা হয়। ধানকে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে চালে রূপান্তরিত করা হয়। চাল পরিষ্কার করে পানিতে ধুয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ পানির সঙ্গে সিদ্ধ করে ভাত প্রস্তুত করা হয়। চালকে গুঁড়া করে আটা প্রস্তুত হয়। আটা থেকে ভাপা পিঠা, চিতই পিঠা, পাটিসাপটা ও দুধ পুলি হরেক পদের পিঠা তৈরি করা হয়। প্রতিটির রন্ধনশিল্পও আলাদা আলাদা। ভাপা পিঠায় গুড়, নারিকেল ইত্যাদি মিশিয়ে এক ধরনের বিশেষ পাতিলের মুখে রাখা হয়। গরম পানির ভাপে পিঠা প্রস্তুত হয়। ধান ভেজানো, সিদ্ধ ও শুকানোর পর বিশেষ প্রক্রিয়ায় চিড়া তৈরি করা হয়। ধান ভেজে ও ফোলানোর মাধ্যমে মুড়ি প্রস্তুত করা হয়।

শেরপুর নদ ও নদী দিয়ে বেষ্টিত। এখানে খাল, বিল, পুকুর ও জলাশয়ের পাশাপাশি প্রধান নদ ও নদী- "ব্রহ্মপুত্র, ভোগাই, নিতাই, কংশ, সোমেশ্বরী, মহারশ্মি, মালিঝি।" [১২] এই অঞ্চল নদ ও নদীতে সমৃদ্ধ হওয়ার কারণে মাছ প্রধান আমিষ খাবার হলেও এখানে শামুক, ঝিনুক, কাঁকড়া ও শুঁটকি মুখরোচক লোকখাদ্যের জোগান দেয়। নদীমাতৃক শেরপুর জেলায় রুই, কাতলা, মৃগেল, কালিবাউশ, বোয়াল, আইড়, বাঘাইড়, চিতল, ফলি, শোল, গজার, টাকি, কই, মাগুর, শিং, পাবদা, গুলশা, টেংরা, বেলে, পুঁটি, মলা, ঢেলা, খলসে, চাঁদা, চেলা, বাইন, কুচিয়া, ইলিশ প্রভৃতি মাছ পাওয়া যায়। অতীতে নদীমাতৃক শেরপুর অঞ্চলে মাছ ছিল মানুষের প্রধান খাদ্যগুলোর একটি। স্থানীয় নদী, খাল, বিল ও জলাভূমি থেকে আহরিত মাছ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ঐতিহ্যবাহী খাবার প্রস্তুত করা হতো। মাছের ঝোল, মাছের ভর্তা, মাছ ভাজা, মাছ পোড়া, সরিষা দিয়ে মাছ, টক মাছ, শাক দিয়ে মাছ, কচু দিয়ে মাছ, লাউ দিয়ে মাছ, কাঁচকলা দিয়ে মাছ, শুঁটকি মাছের ভর্তা, শুঁটকি মাছের ঝোল, মাছের চচ্চড়ি, মাছের পাতুরি, মাছের ডিম ভাজা, মাছের ডিমের বড়া, মাছের তেল দিয়ে ভাত প্রভৃতি ছিল শেরপুরের মাছকেন্দ্রিক লোকখাদ্যের অন্তর্ভুক্ত।

সারণি ২: মাছ থেকে প্রাপ্ত লোকখাদ্য ও রন্ধনপ্রণালী

মাছভিত্তিক লোকখাদ্য	**ব্যবহৃত মাছ**	**রন্ধনপ্রণালী**
মাছের ঝোল	রুই, কাতলা, বোয়াল, শোল, কই, মাগুর, টেংরা প্রভৃতি	মাছ পরিষ্কার করে হলুদ ও লবণ মাখিয়ে ভেজে নেওয়া হয়। পরে পেঁয়াজ, রসুন, আদা, মরিচ, হলুদ ও অন্যান্য মসলা দিয়ে ঝোল রান্না করা হয়।
মাছ ভাজা	পুঁটি, টেংরা, কই, শিং, ছোট দেশীয় মাছ	মাছের সঙ্গে হলুদ, লবণ ও মরিচ মাখিয়ে সরিষার তেলে ভেজে প্রস্তুত করা হয়।
মাছ ভর্তা	ছোট মাছ, শুঁটকি মাছ, পোড়া মাছ	মাছ সিদ্ধ করে এরপর ভেজে কাঁটা ছাড়িয়ে পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ, রসুন, লবণ ও সরিষার তেলের সঙ্গে মিশিয়ে ভর্তা তৈরি করা হয়।
শুঁটকি ভর্তা	চিংড়ি, লইট্টা, ছোট মাছের শুঁটকি	শুঁটকি পরিষ্কার করে ভেজে বা সিদ্ধ করে পেঁয়াজ, মরিচ, রসুন, লবণ ও সরিষার তেল দিয়ে মাখানো হয়।
শুঁটকি ভুনা	বিভিন্ন ধরনের শুঁটকি মাছ	শুঁটকি ভিজিয়ে পরিষ্কার করে পেঁয়াজ, রসুন, মরিচ, হলুদ ও মসলা দিয়ে তেলে ভুনা করা হয়।

মাছের চচ্চড়ি	ছোট মাছ (পুঁটি, মলা, টেংরা), শাকসবজি	মাছের সঙ্গে আলু, বেগুন, কুমড়া, পেঁপে বা অন্যান্য সবজি দিয়ে মসলা মিশিয়ে রান্না করা হয়।
সরিষা মাছ	ইলিশ, রুই, কাতলা বা অন্যান্য বড় মাছ	সরিষা বাটা, কাঁচা মরিচ, হলুদ, লবণ ও সরিষার তেল দিয়ে মাছ রান্না করা হয়।

সূত্র: ক্ষেত্রসমীক্ষা, শেরপুর জেলা, ২০২৫

শেরপুরের সমতল ভূমি, নদী-খাল, জলাভূমি ও পাহাড়ি এলাকার পরিবেশে জন্মানো বিভিন্ন শাক স্থানীয় মানুষের খাদ্যাভ্যাসে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। সরেজমিনে দেখা যায়, পুঁইশাক, লালশাক, কলমিশাক, ডাঁটাশাক, পাটশাক, কচুশাক, হেলেঞ্চাশাক, থানকুনিশাক প্রভৃতি শাক শেরপুর জেলায় বাণিজ্যিক ও প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত হয়। ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী শেরপুর জেলার জনগোষ্ঠীর শাকজাতীয় লোকখাদ্যের ও তার রন্ধনপ্রণালী বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়।

সারণি ৩: শেরপুর জেলার শাকজাতীয় লোকখাদ্যের রন্ধনপ্রণালী

লোকখাদ্যের নাম	**রন্ধনপ্রণালী**
পাটশাক ভর্তা	পাটশাক সিদ্ধ করে পানি ঝরিয়ে পেঁয়াজ, মরিচ, রসুন, লবণ ও সরিষার তেল মিশিয়ে ভর্তা তৈরি করা হয়।
কচুশাক চিংড়ি রান্না	কচুশাক সিদ্ধ করে চিংড়ি মাছ ও মসলা দিয়ে রান্না করা হয়।
কলমিশাক ভাজি	কলমিশাক কেটে পেঁয়াজ, রসুন, কাঁচা মরিচ ও লবণ দিয়ে সরিষার তেলে ভাজি করা হয়।

সূত্র: ক্ষেত্রসমীক্ষা, শেরপুর জেলা, ২০২৫

শেরপুর জেলার আদিবাসীদের নিজস্ব কিছু মৌলিক খাবার ও তার রন্ধনপ্রণালী রয়েছে। গারো পাহাড়সংলগ্ন অঞ্চলে বসবাসরত গারো, কোচ, বর্মণ, হদি(হদি), ডালু ও বানাই আদিবাসীদের লোকখাদ্য মূলত কৃষি, বনজ সম্পদ ও স্থানীয় পরিবেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাদের দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত শস্য, শাকসবজি, বনজ উপাদান, মাছ ও মাংস লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতিনির্ভর খাদ্যাভ্যাসে কম মসলাদার খাবার তাদের মৌলিকত্ব প্রকাশ করে। দৈনন্দিন খাবারের বাহিরেও উৎসব ও সামাজিক অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক খাবারেও বিশেষ আয়োজন ও রন্ধনপ্রণালী দেখা যায়। ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী শেরপুর জেলার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নিজস্ব মৌলিক খাবার ও তার রন্ধনপ্রণালীর বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়।

সারণি ৪: আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নিজস্ব মৌলিক খাবার ও তার রন্ধনপ্রণালী

ক্রমিক নং	**আদিবাসী জনগোষ্ঠীর খাবার**	**প্রধান উপাদান**	**রন্ধনপ্রণালী ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য**
০১	ওয়ান্না/ওয়াক (গারো ঐতিহ্যবাহী খাবার)	চাল, শাকসবজি, মাছ বা মাংস	গারো জনগোষ্ঠীর একটি পরিচিত ঐতিহ্যবাহী রান্না। চাল, সবজি, মাছ বা মাংস একসঙ্গে সিদ্ধ করে কম মসলা দিয়ে রান্না করা হয়। এতে খাবারের স্বাভাবিক স্বাদ বজায় থাকে।
০২	নাখাম বিচি (গারো)	শুকনা মাছ (নাখাম), শাকসবজি, মরিচ	শুকনা মাছ ভিজিয়ে পরিষ্কার করে শাকসবজি ও মরিচের সঙ্গে সিদ্ধ করা হয়। এটি গারোদের পরিচিত ঐতিহ্যবাহী খাবার।
০৩	বাঁশকোড়ার তরকারি	কচি বাঁশের কোড়ল, মাছ/মাংস, মসলা	পাহাড়ি অঞ্চলে পাওয়া কচি বাঁশের কোড়ল পরিষ্কার করে সিদ্ধ করা হয়। পরে মসলা দিয়ে তরকারি বা ভাজি প্রস্তুত করা হয়। গারোসহ পাহাড়সংলগ্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে এর প্রচলন রয়েছে।

০৪	শুঁটকি দিয়ে রান্না	ছোট মাছের শুঁটকি, মরিচ, পেঁয়াজ, শাকসবজি	শুঁটকি ভিজিয়ে পরিষ্কার করে পেঁয়াজ, মরিচ, রসুন ও স্থানীয় মসলা দিয়ে ভুনা বা ঝোল রান্না করা হয়।
০৫	চু/চু-বিচি (গারো ঐতিহ্যবাহী পানীয় ও খাদ্যসংস্কৃতি)	চাল বা শস্য	গারো সমাজে চালভিত্তিক ঐতিহ্যবাহী পানীয় তৈরির প্রচলন রয়েছে। সামাজিক অনুষ্ঠান ও উৎসবে এর ব্যবহার দেখা যায়।
০৬	জুমচাষের শস্যভিত্তিক খাবার	পাহাড়ি ধান, ভুট্টা, কচু, শাকসবজি	জুমচাষে উৎপাদিত উপকরণ দিয়ে সহজ পদ্ধতিতে সিদ্ধ, ভাজি বা ঝোল রান্না করা হয়। এতে স্থানীয় পরিবেশের প্রভাব স্পষ্ট।
০৭	বনজ শাক ও সবজির রান্না	বিভিন্ন বুনো শাক, কচু, লতা-পাতা	বন থেকে সংগ্রহ করা শাক পরিষ্কার করে সিদ্ধ বা ভাজি করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে শুকনা মাছ বা মরিচ দিয়ে স্বাদ বৃদ্ধি করা হয়।
০৮	ভুট্টা ও পাহাড়ি শস্যের খাবার	ভুট্টা, পাহাড়ি শস্য	ভুট্টা সিদ্ধ, ভাজা বা গুঁড়া করে রুটি জাতীয় খাবার তৈরি করা হয়। এটি পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর সহজলভ্য খাদ্যের অংশ।
০৯	স্থানীয় মাছের ঝোল ও ভর্তা	দেশীয় মাছ, মরিচ, পেঁয়াজ, সরিষার তেল	নদী-খাল ও জলাশয় থেকে আহরিত মাছ দিয়ে ঝোল, ভর্তা ও ভুনা তৈরি করা হয়।
১০	মাংসের ঐতিহ্যবাহী রান্না	শূকর, মুরগি বা অন্যান্য মাংস, খারি ।	খারি বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মাংস মসলা দিয়ে রান্না করা হয়। গারোসহ কয়েকটি জনগোষ্ঠীর উৎসবের খাবারে এর গুরুত্ব রয়েছে।

সূত্রঃ ক্ষেত্রসমীক্ষা, শেরপুর জেলা, ২০২৫

তাছাড়া বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে বিশেষ করে পৌষ সংক্রান্তি, নবান্ন, বিবাহ, ঈদ এবং পূজা-পাবর্ণে বিভিন্ন ধরনের ঐতিহ্যবাহী মিষ্টান্ন পাওয়া যায়। এই মিষ্টান্নজাতীয় লোকখাদ্য স্থানীয় কৃষিনির্ভর জীবন, দুধ, চাল, গুড় এবং ফলমূলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত শেরপুর জেলায় স্থানীয় ও ঐতিহ্যগত মিষ্টান্নজাতীয় লোকখাদ্যের কিছু নমুনা উল্লেখ করা যাক যেগুলোর উৎপাদন ও বিপণন শেরপুর জেলাতে হয়।

সারণি ০৫: শেরপুর জেলার মিষ্টান্নজাতীয় লোকখাদ্য ও রন্ধনপ্রণালী

মিষ্টান্নের নাম	**প্রধান উপকরণ**	**সংক্ষিপ্ত প্রস্তুতপ্রণালী**
চিতই পিঠা	চালের গুঁড়া	চালের গুঁড়ার গোলা বিশেষ ছাঁচে ঢেলে ভাপে বা তাপে তৈরি করা হয়; গুড় বা ভর্তার সঙ্গে পরিবেশন করা হয়।
পায়েস	আতপ চাল, দুধ, গুড়/চিনি	দুধে চাল সিদ্ধ করে গুড় বা চিনি মিশিয়ে রান্না করা হয়।
পাটিসাপটা	চালের গুঁড়া, দুধ, নারকেল, গুড়	পাতলা পিঠার মধ্যে নারকেল-গুড়ের পুর দিয়ে ভাঁজ করে তৈরি করা হয়।
পুলি পিঠা	চালের গুঁড়া, নারকেল, গুড়	পুর ভরে সিদ্ধ বা দুধে রান্না করা হয়।
দুধচিতই	চিতই পিঠা, দুধ, গুড়	চিতই পিঠা দুধ ও গুড়ের মধ্যে জ্বাল দিয়ে পরিবেশন করা হয়।

মোয়া	মুড়ি/খই, গুড়	গরম গুড়ের সঙ্গে মুড়ি/খই মিশিয়ে গোল বা চাপা আকারে তৈরি করা হয়।
নারকেলের নাড়ু	নারকেল, গুড়/চিনি	কোরানো নারকেল ও গুড় জ্বাল দিয়ে গোল করে তৈরি করা হয়।
তিলের নাড়ু	তিল, গুড়	ভাজা তিলের সঙ্গে গুড় মিশিয়ে গোল আকারে তৈরি করা হয়।

সূত্রঃ ক্ষেত্রসমীক্ষা, শেরপুর জেলা, ২০২৫

শেরপুর জেলা বাংলাদশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা না হলেও খাবার, সামাজিকতায় সর্বোপরি সাংস্কৃতিক আখ্যানে তার মৌলিকত্ব আছে। লোকখাদ্য একটি ভূখন্ডের লোকজ সংস্কৃতিকে নান্দনিক, বিচিত্রময় ও সমৃদ্ধ করে তোলে।

সামাজিক রূপান্তর

পৃথিবী বদলাচ্ছে প্রতিনিয়ত। প্রকৃতির নিয়মে কিছু পরিবর্তিত হচ্ছে আর বাকিটা মানবসৃষ্ট। প্রকৃতির এই পরিবর্তন মানবজীবনে সরাসরি অভিঘাত করছে। মানুষ বিভিন্ন কারণে অন্তরে বাহিরে বদলে যেতে পারে। যে পরিবর্তন সংস্কৃতির উপর ছাপ ফেলে। কোনো ভূখণ্ডের অন্তর্গত একটি সমাজের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, প্রযুক্তিগত ও পারিবারিক কাঠামোতে সময়ের সঙ্গে সংঘটিত পরিবর্তন সামাজিক রূপান্তর হিসেবে বিবেচ্য। এই পরিবর্তনশীলতা শুধুমাত্র জীবনযাত্রার প্রক্রিয়াকেই প্রভাবিত করে এমন না; মানুষের খাদ্যাভ্যাস, সামাজিক সম্পর্ক, উৎসব, লোকবিশ্বাস, রন্ধনপ্রণালী এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়ের ওপরও তা ব্যাপক প্রভাব ফেলে। ময়মনসিংহ বিভাগের শেরপুর জেলা কৃষিনির্ভর ও বহু সংস্কৃতির জনপদ। এখানে বাঙালি, গারো, কোচ, বর্মণ, হদি(হদি), ডালু ও বানাই আদিবাসী সহ বহুজাতিক মানুষের বসবাস। ঐতিহাসিকভাবে যাদের সহাবস্থানের ফলে যে লোকখাদ্য ও লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে তা বর্তমানে বিশ্বায়ন, নগরায়ণ, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও পরিবর্তিত জীবনধারার প্রভাবে নতুন রূপ ধারণ করছে। সমাজবিজ্ঞানী এন্টনিই গিডেনস উল্লেখ করেন,

> ‘Modernity radically alters the nature of day-to-day social life.’ [১৩]

অর্থাৎ আধুনিকতা সামাজিক জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রকে পরিবর্তন করে। শেরপুরের ক্ষেত্রেও এই পরিবর্তন স্পষ্ট। একসময়ের কৃষিকাজনির্ভর জীবনধারা আজ শিক্ষা, চাকরি, ব্যবসা ও বহুমুখী পেশার মাধ্যমে বৈচিত্র্যময় হয়েছে। এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ এবং ভোগের ধরনে। আগে পরিবারের সদস্যরা নিজেরাই ধান, শাকসবজি, মাছ ও গৃহপালিত প্রাণীর ওপর নির্ভর করে খাদ্যের ব্যবস্থা করলেও বর্তমানে বাজারনির্ভর খাদ্যব্যবস্থা ক্রমশ প্রাধান্য লাভ করেছে।

পারিবারিক কাঠামোর পরিবর্তনও সামাজিক রূপান্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। অতীতে শেরপুরে যৌথ পরিবার ছিল অধিক প্রচলিত। পরিবারের প্রবীণ নারীরা কচুশাক, শুঁটকি, বিভিন্ন ধরনের পিঠা, চিড়া, খই, পায়েস কিংবা মৌসুমি খাদ্য প্রস্তুতের জ্ঞান নতুন প্রজন্মের কাছে মৌখিকভাবে হস্তান্তর করতেন। বর্তমানে একক পরিবারের বিস্তার, কর্মব্যস্ততা এবং সময়ের সংকটের কারণে সেই ধারাবাহিকতা অনেকাংশে ক্ষীণ হয়েছে। ফলে বহু ঐতিহ্যবাহী খাদ্য এখন কেবল উৎসব বা বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ফরাসি সমাজতাত্ত্বিক পিয়ের বুর্দিয়ু খাদ্যাভ্যাসকে সামাজিক পরিচয়ের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে ব্যাখ্যা করে বলেন,

> ‘Taste classifies, and it classifies the classifier.’ [১৪]

অর্থাৎ মানুষের খাদ্যরুচি তার সামাজিক অবস্থান ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রতিফলন। শেরপুরের লোকখাদ্যের ক্ষেত্রেও এ মত অপরিবর্তনীয়। আগে যে খাদ্যগুলো দৈনন্দিন জীবনের অংশ ছিল, আজ সেগুলোর অনেকগুলোই ঐতিহ্যবাহী বা বিশেষ উপলক্ষ্যের খাদ্যে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে দ্রুত প্রস্তুতকৃত খাদ্য, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য এবং বৈশ্বিক খাদ্যসংস্কৃতির প্রসার নতুন প্রজন্মের খাদ্যরুচিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে। বিশ্বায়ন ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশ সামাজিক রূপান্তরের আরেকটি প্রধান চালিকাশক্তি। টেলিভিশন, (আর্ন্তজাল) ইন্টারনেট এবং সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে বৈশ্বিক খাদ্যসংস্কৃতি দ্রুত স্থানীয় সমাজে প্রবেশ করেছে। এর ফলে স্থানীয় খাদ্যসংস্কৃতি একদিকে নতুন উপাদান গ্রহণ করছে, অন্যদিকে কিছু ঐতিহ্যবাহী খাদ্য ধীরে ধীরে দৈনন্দিন জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। তবে এই পরিবর্তনকে কেবল নেতিবাচক হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। বর্তমানে অনেক

তরুণ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে স্থানীয় পিঠা, ঐতিহ্যবাহী রান্না ও লোকজ খাদ্য নিয়ে কাজ করছেন, যা ঐতিহ্য সংরক্ষণে নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। সরেজমিনে দেখা যায়, শেরপুর জেলায় স্থানীয় অনেক সংস্কৃতি ও খাদ্য হারিয়ে যাচ্ছে এবং উল্লেখযোগ্য কিছু লোকখাদ্য হারিয়ে গেছে এখন তার কোন অস্তিত্ব নেই। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে বহুজাতিক কোম্পানির প্যাকেটজাত খাবার যেমন : নুডুল্‌স, স্যুপ, পাস্তা, চিপ্‌স, পৌঁছে যাচ্ছে শেরপুর জেলার গ্রামগুলোতে। শেরপুর জেলার কসবা গ্রামের ৪০ বছর বয়সী রোকেয়া বেগমের থেকে জানা যায়, ৪-৫ বছর ধরে তারা নাস্তা হিসেবে ফাস্টফুড খায়। শেরপুর জেলার গ্রামাঞ্চলে এসব খাবারের প্রচলন খুব একটা বেশি দিনের নয়। শেরপুর জেলার শিক্ষিত শ্রেণীর হার বৃদ্ধির কারণে চাকুরিজীবী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে কর্মব্যস্ত জীবনে মানুষ সময় বাঁচানোর জন্য ফাস্টফুডের (স্যুপ, নুডুল্‌স, পাস্তা, ফ্রাইড রাইস ইত্যাদি) দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ছে। ফলে ঐতিহ্যবাহী লোকখাদ্যগুলো তৈরির প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। অনেক সময় ইচ্ছা থাকলেও সময় স্বল্পতার কারণে তা তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে না। আবার রুচিগত পরিবর্তনের ফলে কিছু খাবারের গ্রহণযোগ্যতা কমে যাচ্ছে আর 'নতুনখাদ্য' জায়গা করে নিচ্ছে তাদের নিজস্ব খাদ্যতালিকায়।

শেরপুর জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের মাঝেও বহুজাতিক কোম্পানির প্রভাব লক্ষ করা গেছে। স্থানীয় বাঙালিদের থেকে এই ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের লোকখাবারগুলো ভিন্ন। তারপরেও তাদের লোকখাদ্যের মাঝে বিদেশি খাবার বিশেষ জায়গা করে নিচ্ছে। এ বিষয়ক একটি সাক্ষাৎকারের নিম্নরূপ -

কেস-১: 'ইদানিং বাচ্চারা খারি আর ভালোবাসে না'

ঝিনাইগাতীর সম্পা দাড়িন (গৃহিণী ৩৪) এর মতে, 'ইদানিং বাচ্চারা আর খারি ভালোবাসে না। মাংসের খারি হলে একটু খায়, সবজির খারি খেতে চায় না। তারা বাইরের খাবার (ফাস্টফুড) খুব তৃপ্তি করে খায় কিন্তু তবে আমার খুব একটা ভালো লাগে না খেতে'।

সম্পা দাড়িনের বক্তব্যে উঠে আসে তাদের সন্তানদের মাঝে রুচিগত পরিবর্তন এসেছে। তার মতে, এ পরিবর্তনের কারণ হচ্ছে সময়ের পরিবর্তন ও বহুজাতিক কোম্পানির প্রসারণ। খারি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের একটি ঐতিহ্যবাহী খাবার। এ খাবারটি তাদের পূর্ব-পুরুষ থেকে চলে আসছে বহু বছর ধরে। খারিসহ আরো অনেক লোকখাদ্যের প্রতি আগ্রহ হারাচ্ছে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীরা। তাদের নিজস্ব খাবারের সাথে মিশে যাচ্ছে অন্য ভিন্ন সংস্কৃতির খাবার। বহুজাতিক কোম্পানির পণ্যের কারণে লোকখাবারগুলোর প্রতি মানুষের আগ্রহ কমে যাচ্ছে। কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে আনতে হয় এ জেলার অতীত ঐতিহ্য। শেরপুরে এলাকাতে অতীতে দেখা গেছে জারি-সারি গান, পালাগান, যাত্রা, পুঁথিপাঠ হতো সেই আসরে নাড়ু, খই, চিঁড়া, কানমোচড়ি প্রভৃতি পাওয়া যেত। বর্তমানের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিনোদন ও ফাস্টফুডের সহজ প্রাপ্তি হওয়ায় মানুষ সে সব লোকজ সংস্কৃতির অনুষঙ্গ থেকে আগ্রহ হারিয়ে ফেলার জন্য শেরপুরের ঐহিত্যগত লোকখাদ্য ও লোকজ সংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে। নৃতত্ত্ববিদ ক্লিফর্ড গিয়ার্টস সংস্কৃতিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন,

'Man is an animal suspended in webs of significance he himself has spun, and I take culture to be those webs. ' [১৫]

এই দৃষ্টিকোণ থেকে লোকখাদ্য কেবল আহারের মাধ্যমই নয়, সাংস্কৃতিক প্রতীক। শেরপুরে নববর্ষ, নবান্ন, বিবাহ, অন্নপ্রাশন, ঈদ, দুর্গাপূজা, ওয়ানগালা কিংবা অন্যান্য সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে প্রস্তুতকৃত ঐতিহ্যবাহী খাদ্য স্থানীয় মানুষের সাংস্কৃতিক পরিচয় ও সামাজিক সম্পর্ককে দৃঢ় করে। সমসাময়িক বাস্তবতায় নবান্নসহ বহু সাংস্কৃতিক আঙ্গিক হারিয়ে যাওয়ার ফলে এগুলোর সাথে যুক্ত লোকখাদ্য প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়নের সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্যানুযায়ী আদিবাসীদের মধ্যেও বৃহৎ পরিবর্তন দেখা যায়, "অতীতে শেরপুর জেলার আদিবাসীদের অবস্থানের পরিধি আরও বিস্তৃত থাকলেও রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে বার বার আক্রান্ত হওয়ায় তাদের পরিধি সংকুচিত হয়েছে। কালের স্রোতে অতীতের অনেক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হারিয়ে গেছে। আদিবাসীরা তাদের ভূমি ও জীবন যাপনের অধিকার আদায়ে বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন সংগ্রাম করেছে। কৃষিই হচ্ছে সমস্ত আদিবাসী সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য নির্মাণ ও নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উৎস। তাই উৎপাদনশীল ভূমি ও চাষাবাদ থেকে আদিবাসীদের সার্বিক জীবন যাত্রাকে আলাদা করে দেখা সম্ভব নয়। দিন দিন কৃষি জমি কমে যাওয়া এবং নানা আর্থসামাজিক সমস্যার মুখোমুখি হওয়ায় শেরপুর জেলার আদিবাসীরা প্রত্যাশিত গতিতে অগ্রসর হতে পারছে না।" [১৬]

জলবায়ু পরিবর্তন, নদীর গতিপথের পরিবর্তন, কৃষিজমির ব্যবহারে রূপান্তর এবং স্থানীয় জীববৈচিত্র্যের হ্রাসের ফলে বহু দেশীয় মাছ, শাক, কন্দ ও বনজ খাদ্যের প্রাপ্যতা কমেছে। এর ফলে কিছু ঐতিহ্যবাহী খাদ্য বিলুপ্তির ঝুঁকিতে রয়েছে। আবার কৃষির আধুনিক প্রযুক্তি ও উন্নত যোগাযোগব্যবস্থার কারণে নতুন খাদ্য উপাদানও সহজলভ্য হয়েছে, যা স্থানীয় খাদ্যসংস্কৃতিকে অভিযোজিত হতে সাহায্য করছে। বলা যায়, শেরপুর জেলার সামাজিক রূপান্তর একদিকে ঐতিহ্যবাহী লোকখাদ্য ও লোকজ সংস্কৃতির ওপর পরিবর্তনের চাপ সৃষ্টি করেছে, অন্যদিকে নতুন সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে অভিযোজনের সুযোগও তৈরি করেছে।

ঐতিহ্য সংরক্ষণ: সম্ভাবনা ও সীমবদ্ধতা

কোন জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পরিচয় ও জীবনধারার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো সেই জনপদের পরম্পরা ভিত্তিক ঐতিহ্য। শেরপুর জেলার লোকখাদ্য ও লোকসংস্কৃতিও স্থানীয় মানুষের সামাজিক সম্পর্ক, পরিবেশগত অভিযোজন ও সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতার সূচক। তবে বর্তমানে আধুনিকায়ন, বিশ্বায়ন, নগরায়ন ও পরিবর্তিত জীবনযাত্রার কারণে এসব ঐতিহ্য বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি। আরও একটি বাঁধা হলো সাংস্কৃতিক জ্ঞান প্রজন্মান্তরে স্থানান্তরের দুর্বলতা। লোকখাদ্য প্রস্তুতির পদ্ধতি, লোকাচার, উৎসব ও মৌখিক ঐতিহ্য মূলত প্রবীণদের স্মৃতি ও চর্চার মাধ্যমে টিকে থাকে। এসব বিষয়ে তরুণ প্রজন্মের আগ্রহ হ্রাস এবং আধুনিক ভোগসংস্কৃতির প্রভাবে অনেক ঐতিহ্য বিলুপ্তির ঝুঁকিতে রয়েছে। পাশাপাশি বাজার অর্থনীতি ও জীবনযাত্রার পরিবর্তনের কারণে অনেক স্থানীয় খাদ্য ও সাংস্কৃতিক অনুশীলনের সামাজিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ছে। তবে ঐতিহ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনাও রয়েছে। নৃতাত্ত্বিক গবেষণা, দলিলীকরণ এবং ডিজিটাল সংরক্ষণের মাধ্যমে লোকজ জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক উপাদান ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করা সম্ভব। একই সঙ্গে সরাসরি সরকারি উদ্যোগ, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ এবং সাংস্কৃতিক আয়োজন ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

পরিশেষ

লোকখাদ্য ও লোকজ সংস্কৃতি কোনো সমাজের কেবল খাদ্যাভ্যাস বা বিনোদনমূলক চর্চার সমষ্টি অনুসঙ্গ নয়, তা জনগোষ্ঠীর নিজস্বতা, ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা, সামাজিক সম্পর্ক, অভিযোজন, অর্থনৈতিক কাঠামো এবং সাংস্কৃতিক উপাদানের বহিঃপ্রকাশ। লোকখাদ্য নিজেই সংস্কৃতির প্রধানতম অঙ্গগুলোর মধ্যে অন্যতম। যা ছাড়া কোন জাতির অস্তিত্ব অকল্পনীয়। বাংলাদেশের শেরপুর জেলার লোকখাদ্য ও লোকজ সংস্কৃতির নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, এই অঞ্চলের লোকখাদ্য ও লোকজ সংস্কৃতি জীবনব্যবস্থা, জাতিগত বৈচিত্র্য, কৃষিব্যবস্থা এবং প্রজন্মান্তরে সঞ্চারিত জ্ঞানব্যবস্থার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। বর্তমান পরিবর্তনশীল আধুনিক বাজারব্যবস্থা, নগরায়ণ, প্রযুক্তির বিপ্লবে শেরপুরের ঐতিহ্যবাহী লোকখাদ্য ও লোকজ সংস্কৃতির পরিবর্তন, অভিযোজন ও কিছু ক্ষেত্রে বিলুপ্তি পরিলক্ষিত হয়েছে। যা সংরক্ষণে জাতীয় ও ব্যক্তিপর্যায়ে দায়িত্ব গ্রহণ করা প্রয়োজন। আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে এর যথাযথ সংক্ষরণ জরুরি। আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা পারে এই অমূল্য সম্পদকে ভবিষৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে।

লেখকদের অবদান

তথ্যসংগ্রহ ও সাহিত্য পর্যালোচনা - শামসুন নাহার সেতু, অধ্যায় পরিকল্পনা ও অধ্যায় বিন্যাস - মো. নাঈম হোসেন (নাঈম রাজ), গবেষণা রীতি-পদ্ধতি ও রেফারেন্স - সাবরিনা নাছরিন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সৌমিত্র ব্যানার্জি ও অভ্র বসুর প্রতি কৃতজ্ঞতা ।

স্বার্থের দ্বন্দ্ব

লেখকগণ ঘোষণা করছেন যে, প্রবন্ধ **"লোকখাদ্য ও লোকজ সংস্কৃতি: বাংলাদেশের শেরপুর জেলার সাংস্কৃতিক পরিচয়ের বিনির্মাণ, সামাজিক রূপান্তর ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের নৃতাত্ত্বিক বীক্ষণ "** এর সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো ধরনের আর্থিক, পেশাগত বা ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বন্দ্ব তাদের নেই।

গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যসূত্র

১. ড.ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃ. ২-৩
২. ড.ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃ. ১২-১৩
৩. ড.ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃ. ১৩
৪.*গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার*, *বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন: শেরপুর জেলা*, সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্য, ২০২৬
৫.*গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার*, *বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন: শেরপুর জেলা*, সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্য, ২০২৬
৬.*গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার*, *বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন: শেরপুর জেলা*, সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্য, ২০২৬
৭. Melville J. Herskovits, *Cultural Dynamics*, Alfred A. Knopf, New York, 1948, p. 17
৮. Clyde Kluckhohn, *Mirror for Man*, McGraw-Hill Book Company, New York, 1944 Greenwich, Conn., p. 32
৯. Pinstrup-Andersen, P., & Derrill D. Watson, *Food Policy for Developing Countries: The Role of Government in Global, National, and Local Food Systems*, Cornell University Press, Ithaca, New York, 2011, pp. 1–3
১০. মুহাম্মদ আবদুস সাত্তার, *বৃহত্তর ময়মনসিংহের লোক সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, প্রতিভাস, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ২৩
১১.গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন: শেরপুর জেলা*, সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্য, ২০২৬
১২.*গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার*, *বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন: শেরপুর জেলা*, সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্য, ২০২৬
১৩. Anthony Giddens, *The Consequences of Modernity*, Stanford University Press, 1990
১৪. Pierre Bourdieu, *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984)*, p. 6
১৫. Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973)
১৬. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন: শেরপুর জেলা*, সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্য, ২০২৬
১৭. শ্রীকেদারনাথ মজুমদার, *ময়মনসিংহের ইতিহাস ও ময়মনসিংহের বিবরণ*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০০